কুরবানীর তাৎপর্য

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী

অনুবাদ: আব্দুল মান্নান তালিব

কুরবানীর তাৎপর্য

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

অনুবাদ

আবদুল মান্নান তালিব

আহসান পাবলিকেশন

মগবাজার ❖ কাটাবন ❖ বাংলাবাজার

কুরবানীর তাৎপর্য

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

প্রকাশনায়
আহসান পাবলিকেশন
১৯১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেট
ঢাকা-১০০০

স্বত্ব : সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ
মার্চ, ১৯৬৫
তৃতীয় প্রকাশ
ডিসেম্বর, ২০০৬

কম্পোজ
মাওলানা ফরিদ উদ্দীন আহমদ
আহসান কম্পিউটার
কাঁটাবন, ঢাকা, ফোন : ৮৬২২১৯৫

প্রচ্ছদ
আহসান কম্পিউটার

মুদ্রণ
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মূল্য : পঁচিশ টাকা মাত্র

Qurbanir Tatpajja by Syed Abul A'la Maududi Translated by Abdul Mannan Talib and Published by Ahsan **Publication** 191 Bara Baghbazar wareless railgate, Dhaka-1217 First **Print** March, 1965 Third Print December, 2006 Price Take 25.00 **Only.** ($ 1.00)

AP-48/06

আমাদের কথা

কুরবানী কি নিছক একটি প্রথা ? শরীয়তের দৃষ্টিতে এটি কোনো বিশেষ তাৎপর্যের অধিকারী কিনা ? এর পেছনে এমন কোনো যুক্তি আছে কিনা বাস্তব জীবনের ঘটনাবলীর সাথে যার সম্পর্ক নিবিড় ? আধুনিক মুসলিম মানসে এ প্রশ্নগুলো যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। এই সংগে সুন্নাতের অথরিটির প্রশ্নও অনেক সংশয়বাদীর চিত্তে দোলা দিয়েছে।

এসব সংশয়ের অবসান এবং সৃষ্ট প্রশ্নাবলীর জন্য কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে কুরবানী সম্পর্কে যুক্তি ও তথ্য নির্ভর আলোচনার প্রয়োজন ছিল। আধুনিক বিশ্বের সেরা ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র.)-এর এ ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি এ উদ্দেশ্য সাধনে পূর্ণ সফলকাম হয়েছে বলে আমরা বিশ্বাস করি। এ জন্যেই বাংলা ভাষাভাষী পাঠক পাঠিকাগণের নিকট এটি উপস্থাপন করা হলো।

১৯৫৯ সালে এটি সর্বপ্রথম তর্জুমানুল কুরআনে প্রবন্ধ আকারে প্রকাশ হয়। অতপর ১৯৬০ সালে 'মাসআলায়ে কুরবানী' নামে উর্দুতে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়।

১৯৬৫ সনে এটি প্রথম বাংলায় প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৭১ সালে প্রকাশিত হওয়ার পর আর এটি মুদ্রিত হয়নি। এখন পুনরায় পুস্তিকাটি প্রকাশের ব্যবস্থা করা হলো। আশা করি পুস্তিকাটি পাঠক মহল কর্তৃক সমাদৃত হবে।

আবদুস শহীদ নাসিম
পরিচালক
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা

قُلْ اِنَّ صَلٰوتِیْ وَنُسُکِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ. لاَ شَرِیْکَ لَهُ وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ. (سورة الانعام : ١٦٣-١٦٢)

"হে মুহাম্মদ (সা) বলো ! আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু একমাত্র বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহর জন্যে। তাঁর কোনো শরীক নাই। আমাকে এরই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর সবার আগে আমিই আনুগত্যের শির নত করছি।"
(সূরা আল-আন'আম : ১৬২-১৬৩)

بسم الله الرحمن الرحيم

কুরবানী

গত কয়েক বছর থেকে আমরা লক্ষ্য করছি যে, প্রত্যেক ঈদুল আযহার সময় পত্র-পত্রিকা, প্রচারপত্র ও পুস্তক পুস্তিকার সাহায্যে কুরবানীর বিরুদ্ধে প্রচারণার সয়লাব বহায়ে দেয়া হয়েছে এবং হাজার হাজার মানুষের মনে এই মর্মে একটা সন্দেহের বীজ উপ্ত করা হয় যে, কুরবানী কোন দ্বীনী আহকামের মধ্যে শামিল নয়, বরং মোল্লা-মৌলবীদের আবিষ্কৃত নিছক একটা ভ্রান্ত, ত্রুটিপূর্ণ ও ক্ষতিকর রেওয়ায মাত্র। এ সন্দেহ নিরসনের জন্যে প্রায় প্রত্যেক বছর আলেম সমাজ বিষয়টি স্পষ্ট করে জনসমক্ষে তুলে ধরেন। কুরবানী যে শরীয়তের নির্দেশ, ওয়াজিব এবং রাসূলুল্লাহ (সা) এ কর্তব্য পালন করে গেছেন, এ সম্পর্কে যথেষ্ট যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা হয় এবং বিরোধী পক্ষের যুক্তির অসারতা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া হয়। তবুও দেখা যায়, এতো কিছুর পরও পরবর্তী বছর আবার সেই অবাঞ্ছিত বিতর্ক, আবার সেই খোঁড়া যুক্তির অবতারণা। মনে হয়, যেন কুরবানীর নির্দেশ শরীয়ত মোতাবিক হবার ব্যাপারে ইতিপূর্বে কোন দলীলই পেশ করা হয়নি এবং বিরোধী পক্ষের যুক্তির অসারতা প্রমাণ করাও সম্ভবপর হয়নি।

গত ঈদুল আযহার সময়ও এ দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি হয়েছে। বরং এবারতো আর এক কদম এগিয়ে আইন করে কুরবানীকে সীমাবদ্ধ করার জন্যে সরকারকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।[১]

আমরা এমন একটা দেশে বাস করছি, যে দেশটি মাত্র কয়েক বছর আগে ছিল অবিভক্ত ভারতের এক অংশবিশেষ। সীমান্তের ওপারে এখনো আমাদের কোটি কোটি দ্বীনী ভাই সাবেক অবিভক্ত ভারতের সেই অংশে

১. এটি ১৯৫৯ সালের বক্তব্য। বর্তমানে এ প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত হয়েছে। অবশ্য বর্তমান ভারতে কুরবানীর পরিবেশ এখনও প্রতিকূলই রয়েছে। –প্রকাশক

বসবাস করছে যেখান থেকে আমরা আলাদা হয়েছিলাম। আজো সেই জাতির সাথে সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছে, একদা যাদের সাথে আমরাও সংগ্রামে লিপ্ত ছিলাম। পরন্তু দেশ বিভাগের পূর্ববর্তী কালের তুলনায় বর্তমানে তারা অনেক বেশী দুর্বলতা ও শক্তিহীনতা অনুভব করছে। যে জাতি আজ তাদের উপর কর্তৃত্ব করছে, তাদের সাথে গরু কুরবানীর ব্যাপারে আমাদের বছরের পর বছর ধরে লাঠালাঠি, মাথা ফাটাফাটি হতো এবং দেশ বিভাগের পর যখন তারা সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হলো, তখন সকলের আগে গরু কুরবানীর অধিকার থেকে তারা মুসলমানদেরকে বঞ্চিত করলো। কিন্তু ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস এই যে, মুসলিম তাহযীব তমদ্দুনকে হিন্দু সভ্যতা সংস্কৃতির প্রভাবমুক্ত করার জন্যে যে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো, সে-ই আজ অগ্রণী হয়ে ভক্তি গদগদ চিত্তে ভারতের হিন্দুদেরকে এই বলে পথ দেখিয়ে দিচ্ছে যে, মহারাজ শুধু গরু কুরবানী কেন, আপনারাতো আইন করে সব রকমের কুরবানী বন্ধ করতে পারেন। আসলে এটি ইসলামী ঐতিহ্যের মধ্যে শামিল নয়। কাজেই এই প্রথা রহিত করলে আপনাদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় বিদ্বেষ প্রবণতার অভিযোগ উত্থাপন করা যেতে পারে না। যেসব মুসলমান ধর্মীয় অধিকারের নামে এর ওপর জোর দিচ্ছে তাদের দাবী সত্য নয়, বরং যেসব হিন্দু ধর্মবিরোধী প্রথা বলে একে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছে প্রকৃতপক্ষে তারাই হকের অনুসারী। আমাদেরকে যেহেতু পাকিস্তানের অশিক্ষিত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠের সাথে বুঝতে হচ্ছে, এজন্যে এখানে আমরা সতর্কতার সাথে পর্যায়ক্রমে একে সীমাবদ্ধ করার পরামর্শ দিয়েছি, কিন্তু আপনারা নিঃশঙ্কচিত্তে কলমের এক আঁচড়েই একে মিটিয়ে দিতে পারেন। এ ব্যাপারে ইসলামী শরীয়ত মুসলমানদের নয়– আপনাদেরই অনুবর্তী।

যে নিদারুণ অবস্থা থেকে খোদা আমাদেরকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন, কতো শীগগীর আমরা তাকে বিস্মৃত হতে পেরেছি। অথচ এখনো আমাদের কোটি কোটি ভাই তার চাপে পিষে মরছে। মনে হয় আমাদের তাহযীব তমদ্দুনকে বিজাতির হাতে তুলে দেবার পরিবর্তে নিজেরাই তার গলায় ছুরি চালিয়ে দেবার জন্যেই আমরা বৃটিশ ভারতে হিন্দুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে আসছিলাম।

মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ বৈষম্যের কোন কমতি ছিল না। শতধা বিচ্ছিন্ন এ জাতি প্রকৃতপক্ষে করুণা লাভেরই যোগ্য ছিল। যদি কারোর প্রাণে এদের প্রতি সত্যিকার মমত্ববোধ ও শুভাকাংখা জেগে উঠতো, তাহলে তিনি অবশ্যই এদের বিচ্ছিন্ন অস্থি পাঁজরগুলোকে একত্রে সংযুক্ত ও সংযোজিত করার চিন্তা করতেন।

কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে, শুভাকাংখার এরাদা বা দাবী নিয়ে যাঁরাই এদিকে অগ্রসর হচ্ছেন, তাঁরাই বহু ব্যাপারে বিরোধের পথ আবিষ্কার করছেন। অথচ সৌভাগ্য বশতঃ সেসব ব্যাপারে প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন ঐক্য বিদ্যমান। মনে হয়, সর্ববাদীসম্মত বিষয়াবলীকেও যেনতেন প্রকার বৈষম্যমূলক প্রমাণ করাই তাঁদের মতে দ্বীনের আসল খিদমত এবং জাতির জন্য প্রকৃত শুভাকাংখা। তাই এমন একটা বিষয়কেও তারা নির্বিবাদে ছেড়ে দিতে চান না, যে সম্পর্কে সমগ্র মুসলিম জাতি একমত বলে দাবী করতে পারে।

কুরবানীও এমনই একটি সর্ববাদীসম্মত বিষয়। হিজরী শতাব্দীর প্রারম্ভকাল থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত মুসলমান এ ব্যাপারে একমত। ইসলামী ইতিহাসের পৌনে চৌদ্দশো বছরেও আজ পর্যন্ত এ বিষয়টি শরীয়ত নির্দেশিত ও রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক সম্পাদিত হবার ব্যাপারে কোন মতবিরোধ দেখা যায়নি। চার ইমাম এবং আহলে হাদীসগণ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত। শিয়া এবং সুন্নীরা এ ব্যাপারে একমত। প্রাচীন যুগের মুজতাহিদগণও এতে একমত ছিলেন এবং আজকের বিভিন্ন দলও একমত পোষণ করেন। কাজেই সম্পূর্ণ নতুন কথা পেশ করে এহেন সর্ববাদীসম্মত ইসলামী প্রথাকে 'মোটেই ইসলামী' নয় বলে সাধারণ মুসলমানকে বুঝাবার চেষ্টা করা বিভেদ ও বৈষম্য সৃষ্টির শয়তানী মনোবৃত্তি ছাড়া আর কি হতে পারে?

তাছাড়া কোন মামুলি বিষয় নয়, এক মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টিকারী বিষয়ের ভিত্তিতে এ বিরোধ সৃষ্টি করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রশ্ন করা হয়েছে যে, কোন্ প্রাধিকার (Authority) বলে তোমারা ঈদুল আযহার সময় কুরবানী

করো? কুরআন তো এর কোন নির্দেশ দেয় না। অন্যকথায় বলা যায়, ইসলামে কুরআনই একমাত্র বিধিসংগত ক্ষমতার অধিকারী। রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাতের সেখানে কোন ক্ষমতাই নেই।

অথচ যে খোদা কুরআন নাযিল করেছেন তিনি নিজের রাসূলও প্রেরণ করেছিলেন। তাঁর কিতাবের ন্যায় তাঁর রাসূলও সমান ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর রাসূলের ক্ষমতা কোনক্রমেই তাঁর কিতাবের চাইতে কম নয়, এমনকি কিতাবের আনুষংগিকও নয়। অথবা রাসূলের মাধ্যমে যে হুকুম দেয়া হয়েছে তার কোন স্তরেই কিতাবের সমর্থনের প্রয়োজন নেই। বরং বলা যায়, রাসূলের প্রাধিকারের ভিত্তিতেই কুরআনকে খোদার কালাম বলে মেনে নেয়া হয়েছে।

যদি রাসূলুল্লাহ (সা) এ কথা না বলতেন যে, খোদা তাঁর ওপর এ কুরআন নাযিল করেছেন, তাহলে একে খোদার কিতাব হিসেবে জানার ও মানবার কোন উপায় এবং কারণ আমাদের কাছে ছিল না। এ পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (সা) যে হুকুম করেছেন, যে পথে তিনি নিজে পরিচালিত হয়েছেন এবং মুমিনগণকে তার ওপর চলার নির্দেশ দিয়েছেন, সে সম্পর্কে যদি বলা হয় যে, তার নির্দেশ কুরআনে উল্লেখিত হলে তবেই তা আমরা মেনে নেবো, নচেৎ তাকে সরাসরি অস্বীকার করবো, তাহলে তার অর্থ এছাড়া আর কি হতে পারে যে, খোদার কিতাব মেনে চলা ওয়াজিব কিন্তু তাঁর রাসূলকে মেনে চলা ওয়াজিব নয়?

এ কথা পুরোপুরি সত্য বিরোধী এবং এতে মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টির উপকরণও আছে।

সত্য বিরোধী এ জন্যে যে, মুহাম্মাদকে (সা) খোদা নিছক একজন হরকরার দায়িত্ব দিয়েই প্রেরণ করেননি। খোদার পয়গাম বান্দার কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েই তাঁর কাজ শেষ হয়ে যাবে, তারপর বান্দা খোদার পত্রখানা নাড়াচাড়া করে নিজের মর্জিমাফিক তাকে কার্যকরী করবে– একথা নয়। কুরআনের দৃষ্টিতেও আহলে ঈমান এবং কাফের উভয় দলের জন্যে রাসূলুল্লাহর (সা) কর্মধারার মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়েছে। কাফেরদের জন্যে অবশ্যই তিনি

নিছক মুবাল্লিগ এবং খোদার দিকে আহ্বানকারী ছিলেন। কিন্তু মুমিনদের জন্যে তো তিনি ছিলেন খোদার কর্তৃত্বের পূর্ণ প্রতিনিধি। তার আনুগত্য খোদারই আনুগত্যের নামান্তর।

مَنْ يُطِيْعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ.

অর্থ : "যে রাসূলের আনুগত্য করে, সে খোদারই আনুগত্য করলো।" রাসূলুল্লাহর (সা) পদাংক অনুসরণ ছাড়া খোদার সন্তুষ্টি হাসিলের দ্বিতীয় পথ নেই।

اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهَ ـ

অর্থ : "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসতে চাও, তাহলে আমার পদাংক অনুসরণ করো। তাহলে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালবাসবেন।"

খোদা তাঁর নিজের পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহকে (সা) শিক্ষক, অভিভাবক, পথপ্রদর্শক, বিচারক, আদেশ-নিষেধ জারীর অধিকার এবং ব্যাপক কর্তৃত্ব দান করেছিলেন। মুসলমানদের চিন্তা-বিশ্বাস, ধর্ম-নৈতিকতা, তাহযীব তমদ্দুন, অর্থনীতি-রাজনীতি প্রভৃতি জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারে খোদার পছন্দ মাফিক নীতিনিয়ম নির্ধারণ করাই তাঁর কাজ ছিল। অপরপক্ষে তাঁর শিক্ষা ও নির্ধারিত নীতি নিয়মের ছাঁচে সমগ্র জীবনকে ঢালাই করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ (সা) যা কিছুর নির্দেশ দিয়েছেন তার জন্যে তাঁর কাছ থেকে প্রাধিকার তলব করার অধিকার কোন মুসলমানের নেই। রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেই এর প্রাধিকার। তাঁর আদেশই আইন। অপরদিকে যে হুকুম রাসূলুল্লাহ (সা) দিয়েছেন, কুরআনে তার উল্লেখ আছে কিনা একথা বলার অধিকারও কোন মুসলমানের নেই। কিতাবের মাধ্যমে বা রাসূলের মাধ্যমে খোদা যে নির্দেশ জারী করেছেন, ক্ষমতা এবং প্রাধিকারের দিক দিয়ে দুটোই সমান এবং খোদার আইনের মর্যাদা লাভের ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

রাসূলুল্লাহর (সা) যাবতীয় নির্দেশ এবং ফয়সালা আইন সংগত অধিকার শুধু এজন্যেই যে, তিনি তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান (Head of the State) ছিলেন– এ কথা সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছু নয়। অর্থাৎ-এর অর্থ এই

দাঁড়ায় যে, যখন তিনি রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন তখন তাঁর আনুগত্য ওয়াজিব ছিল আর এখন যিনি রাষ্ট্রপ্রধান হবেন তাঁর আনুগত্য ওয়াজিব হবে। রিসালাত সম্পর্কে এর চাইতে বিশ্রী ধারণা কোন মানুষের মনে পয়দা হতে পারে না।

রিসালাত সম্পর্কে ইসলাম যে ধারণা পেশ করে, তার সাথে এর দূরতম কোন সম্পর্কও নেই। রাষ্ট্রপ্রধানের পদের সাথে রাসূলের পদের সম্পর্ক কোথায় ? রাষ্ট্রপ্রধানকে সাধারণ মুসলমান নির্বাচিত করে, আবার তারাই তাঁকে পদচ্যুতি ঘটায়। কিন্তু রাসূলকে নির্বাচন করেন আল্লাহ নিজে এবং তাঁকে পদচ্যুত করার এখতিয়ারও একমাত্র তিনিই রাখেন। রাষ্ট্রপ্রধান যে এলাকার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং যতোদিন তিনি এ পদে অধিষ্টিত থাকেন, শুধু সেই এলাকায় ততোদিন তাঁর নেতৃত্ব স্বীকার করে নেয়া হয়। এছাড়া তাঁর ওপর এরূপ ঈমান আনার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না যে, তাঁকে স্বীকার না করলে মানুষ ইসলামী সমাজ বহির্ভূত হবে।

অপরপক্ষে রাসূল যে মুহূর্তে রিসালাত লাভ করেন সে মুহূর্ত থেকে কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ার কোন মানুষ তাঁর ওপর ঈমান না এনে ইসলামী সমাজের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না।

রাষ্ট্রপ্রধান সম্পর্কে মনে মনে আপনার ধারণা খারাপ হতে পারে, প্রকাশ্যেও তাঁকে খারাপ বলতে পারেন, পথে-ঘাটে তাঁর কথা ও কাজের সমালোচনা করতে পারেন, কিন্তু রাসূল সম্পর্কে এ নীতি গ্রহণ করাতো দূরের কথা, এ ধারণা মনে উদয় হলেও ঈমান বিলুপ্ত হয়ে যায়। আপনি স্পষ্ট ভাষায় রাষ্ট্রপ্রধানের আদেশ অস্বীকার করতে পারেন, যতো বাড়াবাড়িই হোক না কেন একে একটা অপরাধই বলা হবে। কিন্তু রাসূলের হুকুমকে রাসূলের হুকুম বলে জানার পরও যদি আপনি তা মেনে নিতে অস্বীকার করেন, তাহলে নিঃসন্দেহে আপনি ইসলাম বহির্ভূত হয়ে যাবেন। তাঁর হুকুমের বিরুদ্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপনের অধিকারই আপনার নেই। বরং এর বিরুদ্ধে অন্তরে কোন সংশয়-সংকোচ অনুভব করাই ঈমান বিরোধী।

রাষ্ট্রপ্রধান জনসাধারণের প্রতিনিধি এবং রাসূল খোদার প্রতিনিধি। রাষ্ট্রপ্রধানের কথা আইন নয় বরং আইন তার কথার ওপর কর্তৃত্ব করে। কিন্তু খোদার রাসূলের কথাই আইন। কেননা তাঁর কথার মাধ্যমেই খোদা

তাঁর নিজের আইন বিবৃত করেন। কাজেই রাসূলকে নিছক একটা এলাকা এবং বিশেষ যুগের রাষ্ট্রপ্রধানের মর্যাদা দান করে এ কথা কেমন করে বলা যেতে পারে যে, তিনি যেসব আহকাম এবং নির্দেশ দিয়েছেন, তা শুধু সেই এলাকা এবং যুগের মানুষের করণীয় ছিল, আজকের যুগে তা আইনের মর্যাদা লাভ করতে পারে না ? এ নিছক ভ্রান্ত ও অন্ধ মনোবৃত্তির পরিচায়ক।

এ তো গেল চিরন্তন সত্যের বিরুদ্ধে চিন্তার বিদ্রোহ। এখন এর বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ক্ষমতার কথাই বলি। আজ যাকে আপনি ইসলামী জীবন বিধান এবং ইসলামী কৃষ্টি-তমদ্দুন বলে থাকেন, যার বিভিন্ন নীতি এবং বাস্তব প্রকাশের ঐক্য সমগ্র দুনিয়ার মুসলমানকে এক মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত করেছে, যার রঙের ঐক্য মুসলমানকে মুসলমানের সাথে যুক্ত করে কাফের থেকে পৃথক করেছে, যার উজ্জ্বল বৈশিষ্ট মুসলমানকে সমস্ত দুনিয়ার কাফেরদের থেকে পৃথক করেছে এবং সকলের থেকে পৃথক করে তাদেরকে এক স্বয়ং সম্পূর্ণ উম্মতে পরিণত কয়েছে; তাকে বিশ্লেষণ করলে বুঝতে পারবেন যে, তার নয়-দশমাংশ বস্তুই রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর রিসালাতের কর্তৃত্বাধীনে মুসলমানদের মধ্যে জারী করেছেন এবং হয়তো বা এক দশমাংশ বস্তু এমন পাওয়া যাবে, যা কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে।

আবার এই এক দশমাংশের অবস্থা হলো এই যে, তাকে কার্যকরী করার জন্যে যদি রাসূল (সা) নির্ধারিত শরীয়তের বিধি ব্যবস্থার অনুসরণ ওয়াজিব না হয়, তাহলে দুনিয়ার বিভিন্ন মুসলমান– ব্যক্তি দল ও রাষ্ট্র তাকে কার্যকরী করার জন্যে এতো বিভিন্ন ও বিপরীত পথ আবিষ্কার করবে যে, তাদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতির চিহ্নমাত্রও বাকী থাকবে না। এখন আপনি নিজেই চিন্তা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মুসলমানদের মধ্যে যা কিছু জারী করেছেন, তার সবটুকুই যদি বাদ দেয়া হয়, তাহলে ইসলামে আর এমন কি অবশিষ্ট থাকতে পারে, যাকে আমরা ইসলামী কৃষ্টি-তমদ্দুন বলতে পারবো এবং যাকে কেন্দ্র করে দুনিয়ার সমস্ত মুসলমান একত্রিত হতে পারবে ?

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, আযান দেবার প্রথা দুনিয়ার মুসলমানদের একটা সবচাইতে স্পষ্ট এবং প্রকাশ্য জাতীয় ঐতিহ্য। পৃথিবীর প্রত্যেক স্থানে মুসলমান এবং কাফের প্রতিদিন পাঁচবার করে এ আওয়ায শুনে থাকে। এ

প্রথাটি রাসূলুল্লাহ (সা) নির্ধারণ ও প্রবর্তন করেছেন। কুরআনে এর হুকুম দেয়া হয়নি। তার কোন শব্দ থেকেও এমন নির্দেশ পাওয়া যায় না যে প্রতিদিন পাঁচবার নামায পড়ার পূর্বে এভাবে জোর গলায় মানুষকে আহ্বান করতে হবে। কুরআনে শুধু এক জায়গায় এতটুকু বলা হয়েছে :

اِذَا نُوْدِیَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ یَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰی ذِكْرِ اللّٰهِ.

অর্থ : "যখন জুমার দিনে নামাযের জন্য আহ্বান করা হয়, খোদার স্মরণের দিকে ধাবিত হও।"

বলা বাহুল্য এটি আহ্বান শুনে ধাবিত হবার হুকুম, কিন্তু আহ্বান করার হুকুম নয়। অন্য এক স্থানে আলহে কিতাবদের সম্পর্কে বলা হয়েছে :

اِذَا نَادَیْتُمْ اِلَی الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا.

অর্থ : "যখন তোমরা নামাযের জন্যে আহ্বান করো, তারা সেটাকে বিদ্রূপ ও খেলায় পরিণত করে।"

আসলে এ কোন নির্দেশই নয়, শুধু একটা প্রচলিত ব্যাপারের প্রতি বিদ্রূপ করার জন্যে আহলে কিতাবদের নিন্দা করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো এই যে, আযানের শব্দ নির্ধারণ এবং মুসলমানদের মধ্যে তার প্রচলনের এখতিয়ার ও কর্তৃত্ব যাকে দেয়া হয়েছে, তাঁর বিশ্বজনীন শরীয়ত নির্ধারণের অধিকার যদি না থেকে থাকে, তাহলে কি শুধু উল্লেখিত দুটি আয়াতের ভিত্তিতেই আজ দুনিয়ার সর্বত্র একই আযান উচ্চারিত হচ্ছে?

তাছাড়া যে জামায়াতের সাথে নামায পড়ার জন্যে আহ্বান উচ্চারিত হয়, সেই নামাযের ব্যাপারটাই লক্ষ্য করে দেখুন। এই যে জুমার নামায, যার আহ্বান শুনে ধাবিত হবার নির্দেশ নেয়া হয়েছে; দুই ঈদের নামায, যাতে হাজার হাজার মুসলমান একত্রিত হয়, সর্বোপরি এই যে মসজিদগুলো, যা সমগ্র দুনিয়ার মুসলিম সমাজের জীবনধারার কেন্দ্র স্থলে পরিণত হয়েছে; এদের মধ্যে কোন একটিরও নির্দেশ কুরআনে দেয়া হয়নি। কুরআন শুধু নামাযের হুকুম দেয়, কাতার বদ্ধ হয়ে জামায়াতে নামায পড়ার কোন স্পষ্ট নির্দেশ দেয় না। জুমার নামাযের জন্যে কুরআনের নির্দেশ শুধু এই যে, তার

জন্যে আহ্বান করা হলে সেদিকে ধাবিত হতে হবে। খুব টেনে ছিড়ে হয়তো এথেকে জুমার নামায কায়েম করার হুকুম বের করা যেতে পারে। দুই ঈদের নামাযের তো উল্লেখ মাত্রও কুরআনে নেই।

মসজিদের ব্যাপারে বলা যেতে পারে যে, কুরআনে এর প্রতি অবশ্যই সম্মান প্রদর্শনের হুকুম দেয়া হয়েছে কিন্তু কোথাও বলা হয়নি– 'হে মুসলমানগণ, তোমাদের প্রত্যেক গ্রামে মসজিদ নির্মাণ করো, হামেশা তাতে জামায়াতের সাথে নামায কায়েম করার ব্যবস্থা করো।' মুসলমানদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) এসবগুলোর প্রচলন করেছিলেন শুধুমাত্র সেই এখতিয়ার ও কর্তৃত্ব বলে যা দান করে আল্লাহ তাঁকে শরীয়ত প্রবর্তনকারী নিযুক্ত করেছিলেন।

যদি এ এখতিয়ার ও কর্তৃত্ব সর্বজনস্বীকৃত না হতো, তাহলে ইসলামের এ বিরাট ঐতিহ্যটি কখনো প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো না, যা মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করতে, একই ছাঁচে ঢালাই করতে এবং ইসলামী তমদ্দুনের ইমারত গড়তে সবচেয়ে বেশী অংশগ্রহণ করেছে। ফলে মুসলমানরা আজ ঈসায়ীদের চাইতেও বেশী বিশৃঙ্খল ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পৃথিবীর বুকে বিরাজ করতো।

পথ চলতি মানুষের মতো আমি এখানে শুধু চারদিককার কয়েকটা দৃশ্য তুরে ধরলাম। নচেৎ বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করলে জানা যাবে যে, আল্লাহ যদি আমাদের কাছে শুধু একটি কিতাব পাঠাতেন এবং তার সাথে সাথে কোন রাসূল এসে ব্যক্তিগত জীবন থেকে নিয়ে খান্দান, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত আমাদের যাবতীয় ব্যাপারের জন্যে একটি বিশেষ তমদ্দুনের সৃষ্টি না করতেন, তাহলে আজ একটা ঐক্যবদ্ধ বিশ্বজনীন জাতি হিসেবে আমাদের কোন বৈশিষ্টই থাকতো না।

বর্তমানে যে ব্যক্তি এই রিসালাতের শরয়ী ক্ষমতা এবং আইন প্রণয়নের অধিকারকে চ্যালেঞ্জ করে শুধু একটা কুরবানী অথবা অন্যান্য দু'চারটে বিক্ষিপ্ত ব্যাপার এই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় না, বরং ইসলামী তমদ্দুনের সমগ্র ব্যবস্থা এবং বিশ্বজনীন ইসলামী সমাজের ভিত্তিমূলই এর আঘাতে নড়ে ওঠে। যতক্ষণ আমরা আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত না হই, ততক্ষণ কারুর এ

কথা আমরা মোটেই স্বীকার করে নিতে পারি না যে, কুরআনে যার নির্দেশ আছে শুধু সেটিই বাকি থাকবে আর রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশে যা কিছু করা হয়, সমস্তই বিলুপ্ত করে দিতে হবে।

বিরোধিতার এই ভ্রান্ত বুনিয়াদ এবং এর মারাত্মক পরিণতি হৃদয়ংগম করার পর এবার আসল কথায় আসা যাক– যে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হচ্ছে। কুরবানী সম্পর্কে একথা বলা হচ্ছে যে, কুরআনে এর কোন হুকুম দেয়া হয়নি, নিছক সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছু নয়! আসলে যে নীতিগত সত্যের ভিত্তিতে খোদার জন্যে মানুষের প্রাণী কুরবানী করা উচিত, কুরআন শুধুমাত্র সেই নীতির কথাই বিবৃত করে এবং তারপরেই একটা সাধারণ নির্দেশ ঘোষণা করে। এ নির্দেশকে কার্যকরী করার কোন বিস্তারিত পরিকল্পনা সে পেশ করে না। আসলে কাজটি ছিল রাসূলুল্লাহর (সা)।

যে খোদা তার ওপর কুরআন নাযিল করেছেন, তাঁরই নির্দেশে তিনি এর বাস্তবচিত্র, স্থান-কাল এবং নির্ভুল পন্থা মুসলমানদেরকে বাতলিয়েছেন এবং নিজেও একে কার্যকরী করেছেন। শুধুমাত্র কুরবানীর সাথে এ কাজের সম্পর্ক নেই, কুরআনের অন্যান্য আহকামের ব্যাপারেও রাসূলুল্লাহ (সা) একই কাজ করেছেন। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, বিবাহ, তালাক, সম্পত্তি বণ্টন তথা মুসলিম সমাজ, ধর্ম, কৃষ্টি-তমদ্দুন, অর্থনীতি, রাজনীতি, আইন-আদালত, যুদ্ধ-সন্ধি প্রভৃতি যাবতীয় ক্ষেত্রে এই নীতিই কার্যকরী হয়েছে। উপরোল্লিখিত ব্যাপারগুলোর কোনটি সম্পর্কে কুরআন সংক্ষিপ্তভাবে আবার কোনটির সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে নির্দেশ দিয়েছে অথবা খোদার ইচ্ছার সামান্য ইংগিত মাত্র প্রদান করেই ক্ষান্ত হয়েছে। তারপর সেগুলোকে কার্যকরী করার জন্যে রাসূলুল্লাহ (সা) স্পষ্ট সীমারেখা নির্ধারণ করেছেন, নিজেই সেগুলোকে কার্যকরী করে দৃষ্টান্ত কায়েম করেছেন এবং নিজের নেতৃত্ব ও তত্ত্বাবধানে তাদের প্রচলন করেছেন।

কোন বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি একথায় সন্দেহ পোষণ করতে পারবেন না যে, কিতাবের নেতৃত্বের সাথে সাথে এই কর্মের নেতৃত্বেরও মানুষের প্রয়োজন ছিল এবং এ নেতৃত্বের যোগ্যতা ও অধিকার খোদার রাসূল (সা) ছাড়া আর কারুর নেই।

এ ব্যাপারে কুরআনে যে নীতিগত কথা বলা হয়েছে, তা হলো এই :

১. গায়রুল্লাহর জন্যে ইবাদতের যেসব রীতি-পদ্ধতি মানুষ গ্রহণ করেছে, খোদার দ্বীনে গায়রুল্লাহর জন্য তা সবই হারাম এবং আল্লাহর জন্যে সেগুলো ওয়াজিব করে দেয়া হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে, গায়রুল্লাহর সামনে মানুষ মাথা নত করতো এবং সিজদাও করতো। খোদার দ্বীন এটিকে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যে ওয়াজিব করেছে এবং এ উদ্দেশ্যে তাঁর জন্যে নামাযের প্রবর্তন করেছে। মানুষ গায়রুল্লাহর সামনে আর্থিক নজরানা পেশ করতো। খোদার দ্বীন এটিকে একমাত্র আল্লাহর জন্যে ওয়াজিব করেছে এবং যাকাত নির্ধারণ করে তার মধ্য দিয়ে এর বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তুলেছে।

মানুষ গায়রুল্লাহর নামে উপবাস থাকতো। খোদার দ্বীন এটিকে একমাত্র আল্লাহর জন্যে ওয়াজিব করেছে এবং এ উদ্দেশ্যে রমযানের রোযাকে ফরয করে দিয়েছে। মানুষ গায়রুল্লাহর জন্যে তীর্থযাত্রা এবং পবিত্র স্থানগুলোর তওয়াফ করতো। খোদার দ্বীন এ উদ্দেশ্যে একটি বায়তুল্লাহ নির্মাণ করে তার জন্যে হজ্জ এবং তওয়াফকে ফরয করে দিয়েছে। মানব মনের এই ধারা অনুযায়ী অতি প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্তও গায়রুল্লাহর জন্যে মানুষ কুরবানী করে আসছে। খোদার দ্বীন এটিকেও গায়রুল্লাহর জন্যে হারাম করে দিয়েছে এবং হুকুম জারী করেছে যে, কুরবানী একমাত্র খোদার জন্যে হওয়া উচিত।

সুতরাং দেখুন, কুরআন মজীদ একদিকে ما اهل لغير الله به (মা উহিল্লা লিগাইরিল্লাহি বিহী) "গায়রুল্লাহর নামে যাকে যবেহ করা হয়েছে" এবং ما ذبح على النصب (মা যুবিহা আলান নুসুব) "তীর্থ স্থানের ওপর যাকে যবেহ করা হয়েছে" তাকে পুরোপুরি হারাম ঘোষণা করেছে এবং অপরদিকে হুকুম দিচ্ছে فصل لربك وانحر (ফা ছাল্লিলিরাব্বিকা ওয়ানহার) "তোমার প্রতিপালকের জন্যে নামায পড়ো এবং তাঁরই জন্যে কুরবানী করো।"

২. খোদা মানুষকে যেসব নিয়ামত দান করেছেন, সে সবের জন্যে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা মানুষের ওপর ওয়াজিব এবং প্রত্যেক নিয়ামতের

জন্যে এ কৃতজ্ঞতার প্রকাশ কুরবানী ও নযরানার আকারে হওয়া উচিত। ঈমান এবং আনুগত্যের পথ এখতিয়ার করেই মানুষ মন ও প্রাণের দানের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে। নামায এবং রোযা পালন করেই মানুষ দেহ এবং তার সমস্ত শক্তি দানের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে। অর্থ দানের কৃতজ্ঞতা যাকাতের আকারেই প্রকাশ করা যেতে পারে। যাকাতের পদ্ধতিও এমন যে, সোনা-রূপার যাকাত সোনা-রূপা থেকে, কৃষি দ্রব্যের যাকাত কৃষি দ্রব্য থেকে এবং গৃহপালিত পশুর যাকাত গৃহ পালিত পশু থেকেই আদায় করতে হবে।

অনুরূপভাবে খোদার সৃষ্ট জন্তু জানায়োরের ওপর তিনি মানুষকে যে কর্তৃত্ব দান করেছেন এবং তাথেকে বিভিন্ন কাজ নেবার যে সুযোগ দিয়েছেন, তাদের মধ্য থেকেই কোন জানোয়ারকে খোদার জন্যে কুরবানী করাই এ দানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্ভুল পদ্ধতি। এ জন্যেই সূরায়ে হজ্জে কুরবানীর নির্দেশ দেবার পর তার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

كذالك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.

(কাযালিকা সাখখারনাহা লাকুম লায়াল্লাকুম তাশকুরূন)

অর্থ : "এভাবেই তাদের ওপর তোমাদেরকে কতৃত্ব দান করেছি; যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশে প্রবৃত্ত হও।"

৩. খোদা তাঁর সৃষ্ট বস্তুরাজির ওপরে মানুষকে যে কর্তৃত্ব দান করেছেন এবং তাদেরকে ইচ্ছামত ব্যবহারের যে সুযোগ মানুষ লাভ করেছে, তার জন্যেই মানুষকে খোদার শ্রেষ্ঠত্ব, কর্তৃত্ব ও মালিকানার স্বীকৃতি দেয়া উচিৎ। ফলে মানুষের মনে কখনো এ ভুল ধারণার সৃষ্টি হবে না যে, এসব কিছু তারই এবং সেই এদের একচ্ছত্র মালিক। খোদার বিভিন্ন দানের ব্যাপারে এই শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দানের বিভিন্ন পদ্ধতি নির্ধারিত হয়েছে। জন্তু জানোয়ারের বেলায় তাদেরকে খোদার নামে কুরবানী করাই এই পদ্ধতির মূর্ত প্রকাশ। এ জন্যেই এ প্রসংগে সূরায়ে হজ্জের অন্য এক স্থানে বলা হয়েছে :

كذالك سخرها لكم لتكبر الله على ما هدكم.

(কাযালিকা সাখ্খারাহা লাকুম লিতুকাব্বিরুল্লাহা আলা মা হাদাকুম)

অর্থ : এভাবেই আল্লাহ্ তাদের ওপর তোমাদেরকে কর্তৃত্ব দান করেছেন, তোমাদেরকে যে হিদায়াত তিনি দিয়েছেন তার জন্যে তোমরা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশে প্রবৃত্ত হও।"

এই তিনটি কারণের ভিত্তিতেই কুরআন মজীদ আমাদেরকে জানিয়েছে যে, সকল যুগে সকল দেশেই প্রত্যেক উম্মতের জন্যে খোদা কুরবানীর পদ্ধতি প্রবর্তন করেছেন।

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ. (سورة الحج : ٣٤)

অর্থ : "এবং প্রত্যেক উম্মতের জন্যে আমরা কুরবানীর একটি পদ্ধতির প্রচলন করেছি, যে জানোয়ার খোদা তাদেরকে দান করেছেন তার ওপর যেন তারা তাঁর নাম উচ্চারণ করে।" (সূরা হাজ্জ : ৩৪)

এ পদ্ধতি যেমন অন্যান্য উম্মতের জন্যে ছিল তেমনি শরীয়তে মুহাম্মদীর অনুবর্তী মুসলমানদের জন্যেও প্রবর্তিত হয়েছে :

قُلْ اِنَّ صَلٰوتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَایَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ.

অর্থ : "হে মুহাম্মদ (সা) বলো, আমার নামায, কুরবানী এবং আমার জীবন ও মৃত্যু শুধু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্যে। তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমাকে এরই হুকুম দেয়া হয়েছে। আর আমিই সবার আগে আনুগত্যে শির অবনতকারী।" (সূরা আল আন'আম : ১৬২-১৬৩)

কুরবানীর জন্যে কুরআনে এরূপ সাধারণ নির্দেশের উল্লেখ আছে। এগুলোয় বলা হয়নি যে, কুরবানী কবে করা হবে, কোথায় করা হবে এবং কার ওপর করা ওয়াজিব। তাছাড়া এ নির্দেশকে কার্যকরী করার বিস্তারিত নিয়ম-কানুন কি হতে পারে, তাও এতে বলা হয়নি। আসলে এগুলো বিবৃত করার এবং একে বাস্তবায়িত করে দেখিয়ে দেবার দায়িত্ব খোদা তাঁর রাসূলের (সা) ওপর অর্পণ করেছেন। কেননা রাসূলকে (সা) তিনি বিনা প্রয়োজনে

পাঠাননি। কিতাবসহ রাসূল (সা) প্রেরণের অর্থই এ ছিল যে, তিনি মানুষকে কিতাবের আদর্শ ও উদ্দেশ্য মোতাবিক কাজ করার তালীম দেবেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) এর জন্য কোন্ পদ্ধতি নির্ধারিত করেছিলেন এবং সে পদ্ধতি রাসূল (সা) নির্ধারিত প্রামাণ্য পদ্ধতি কিনা এবার আমরা সেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হবো।

প্রথমতঃ রাসূলুল্লাহ (সা) মানুষের ইচ্ছা বাসনার ওপর একথা ছেড়ে দেননি, যে বক্তিগতভাবে যে কোন মুসলমান তার ইচ্ছা মত যে কোন সময় যে কোন জানোয়ার কুরবানী করতে পারবে। বরং সমস্ত উম্মতের জন্যে তিনি তিনটি দিন নির্ধারিত করেছেন। সমগ্র দুনিয়ার মুসলমান প্রতি বছর এ তিন দিনেই তাদের কুরবানী আদায় করবে। এটা সম্পূর্ণতঃ ইসলামেরই নিজস্ব প্রকৃতির অনুসারী। নামাযের ব্যাপারেও একই পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। ফরয নামাযগুলোকে প্রতিদিন পাঁচ বার জামায়াতের সাথে আদায় করার হুকুম দেয়া হয়েছে। সপ্তাহে একবার জুমার নামাযের হুকুম দেয়া হয়েছে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের চাইতেও বড়ো জামায়াতে মুসলমানরা এটি আদায় করতে পারবে। বছরে দু'বার ঈদের নামাযের হুকুম দেয়া হয়েছে। জুমার নামাযের চাইতেও বড়ো জামায়াতে মুসলমানরা এ দু'টো আদায় করতে পারবে। অনুরূপভাবে রোযার ব্যাপারেও সমস্ত মুসলমানের জন্যে একটি মাস নির্ধারিত হয়েছে। সবাই মিলিতভাবে একই সময়ে এ ফরয আদায় করতে সক্ষম হবে। ইবাদতের এই সামগ্রিক পদ্ধতির মধ্যে অনেক উপকারের বীজ নিহিত আছে।

সামগ্রিকভাবে যে ইবাদত আদায় করা হয়, সমগ্র সমাজে তার জন্য একটা বিশেষ পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এর ফলে মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য সংহতির উন্মেষ ঘটে। খোদা পরস্তির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বুনিয়াদের ওপর মুসলমানরা পরস্পরের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিশেষ গুণাবলীর অধিকারী হয় এবং একই সাথে ব্যক্তিগতভাবে ইবাদত করার সমস্ত ফায়দাও তারা লাভ করতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ রাসূলুল্লাহ (সা) এর জন্যে বিশেষ করে একটি 'ঈদের দিন' ঘোষণা করেছেন এবং মুসলমানদেরকে প্রথমে সবাই মিলে দু'রাকআত নামায আদায় করে তারপর নিজের কুরবানী দেবার নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআনে ঠিক এরই ইংগিত পাওয়া যায়। কুরআনে নামাযের সাথে সাথে কুরবানীর কথাও উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ ব্যাপারে নামাযকে কুরবানীর আগে স্থান দেয়া হয়েছে– إِنَّ صَلَوتِى وَنُسُكِى (ইন্না ছালাতী ওয়া নুসুকী) "নিশ্চয় আমার নামায ও আমার কুরবানী", فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (ফাছাল্লি লিরাব্বিকা ওয়ানহার) "তোমার প্রতিপালকের জন্যে নামায পড়ো এবং কুরবানী করো।

এতদুপরি মুসলিম সমাজের একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন এথেকে পূর্ণ হয়। প্রত্যেক সমাজই সামগ্রিকভাবে কতিপয় উৎসব পালনের প্রত্যাশী। এই উৎসবগুলোয় তার সকল ব্যক্তিই এক সাথে মিলেমিশে আনন্দ প্রকাশ করে এবং তাদের মধ্যে একটা আবেগমধুর ঐক্য ও সংহতির সৃষ্টি হয়। উৎসবের একটা বিশেষ চিত্র হলো এই যে, এর আরম্ভ হয় আল্লাহর একটি ইবাদত অর্থাৎ নামায দিয়ে এবং সমগ্র উৎসবকালেই কোন না কোন গৃহে আল্লাহর অন্য একটি ইবাদত অর্থাৎ কুরবানী আদায় করা হয়। এ ইবাদতের ফলে প্রত্যেক গৃহস্ত তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং গরীব প্রতিবেশীদেরকে উপহার-তোহ্ফা প্রেরণ করে। এ ব্যবস্থা ইসলামী ভাবধারা এবং মুসলিম সমাজ প্রকৃতির পুরাপুরি অনুসারী। ইসলাম নাচ-গান, খেলা-ধূলা এবং বিচিত্রানুষ্ঠানের উৎসব চায় না। সে তার সৃষ্ট সমাজের জন্যে উৎসবের স্বাভাবিক চাহিদাকে এ ধরনের ঈদের দ্বারাই পূর্ণ করতে চায়– যে ঈদ খোদাপরস্তি, প্রেম, প্রীতি ভালোবাসা ও হামদর্দির নিষ্পাপ অনুভূতিতে ভরপুর।

তৃতীয়তঃ রাসূলুল্লাহ (সা) এর জন্যে সেই বিশেষ দিনটি নির্বাচন করেছেন, যে দিন হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাঈল (আ) ইসলামী ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম কাজ সমাধা করেছিলেন। অর্থাৎ বৃদ্ধ পিতা খোদার ইশারা পেয়েই নিজের একমাত্র যুবক পুত্রকে কুরবানী করার জন্যে শান্ত ও ধীর চিত্তে অগ্রসর হয় এবং খোদা তার জানের কুরবানী প্রত্যাশা করেন,

একথা শুনে পুত্র ছুরির নীচে সন্তুষ্ট চিত্তে গর্দান পেতে দিয়েছিলেন। এভাবে এটি নিছক কুরবানীর ইবাদত না হয়ে একটি বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতিচিহ্নে পরিণত হয়েছে। এ স্মৃতিচিহ্নকে মুমিনের জীবনের এই চূড়ান্ত লক্ষ্য, তার এই আদর্শ ও উচ্চতর দৃষ্টান্তকে মুসলমানদের সম্মুখে সঞ্জীবিত করে একথা বুঝিয়ে দেয় যে, খোদার সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে নিজের সবকিছু কুরবান করে দেবার জন্য তাদের হামেশা প্রস্তুত থাকা উচিত।

কুরবানীর নির্দেশ প্রতিপালন এবং ঈদ উৎসব উদযাপনের জন্য বছরের যে কোন একটা দিন নির্ধারণ করা সম্ভব ছিল। এর থেকে অন্যান্য যাবতীয় ফায়দা হয়তো হাসিল হয়ে যেতো, কিন্তু এ ফায়দা কিছুতেই হাসিল হতো না। এ জন্যে এ বিশেষ দিনের নির্বাচন এক ঢিলে দুই পাখী মারার মতো। রাসূলুল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হলো : مَاهٰذِهِ الْاَضَاحِىْ (মা হাযিহিল আযাহী) "এ কুরবানীগুলো কি?" তিনি জবাব দিলেন : سُنَّةُ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ। (সুন্নাতু আবীকুম ইবরাহীম) "তোমাদের পিতা ইবরাহীমের সুন্নাত।" (মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাযা)

এর থেকে বুঝা যায়, হযরত ইবরাহীম (আ) এই ঘটনার পর প্রতি বছর এই তারিখেই জানোয়ার কুরবানী করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা) এ সুন্নাতটি যিন্দা করেন এবং নিজের উম্মতদেরকে নির্দেশ দেন যে, কুরআনে কুরবানীর যে সাধারণ হুকুম দেয়া হয়েছে, বিশেষ ব্যবস্থাপনার সাথে সেই বিশেষ দিনেই তাকে তামীল করতে হবে, যেদিন হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর মহান কুরবানীর স্মৃতিকে সঞ্জীবিত করতেন। দুনিয়ার প্রত্যেক জাতিই তার ইতিহাসের স্মরণীয় ঘটনাবলীর "দিবস" উদযাপন করে থাকে। ইসলামী ভাবধারায়ও স্মৃতি পালনের জন্যে সেই বিশেষ দিবসটিই নির্বাচিত হয়েছে, যে দিনটিতে খোদার দুটি বান্দা খোদা পরস্তির অগ্নি-পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

চতুর্তথঃ কুরবানীর জন্যে এ বিশেষ দিনের নির্বাচনের মধ্য আর একটা উদ্দেশ্যও ছিল। হিজরতের পর প্রথম বছরই যখন হজ্জের সময় উপস্থিত হলো, তখন মক্কার কাফেররা হারাম শরীফের দুয়ার তাদের জন্যে অবরুদ্ধ

করে রেখেছিল– একথা মুসলমানদের মনে কাঁটার মতো বিধছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের এই মানসিক ব্যথা নিরাময়ের জন্যে হজ্জের দিনগুলোকে মদীনায় তাদের জন্যে ঈদের দিনে পরিণত করলেন। তিনি তাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, ৯ই যিলহজ্জের (অর্থাৎ হজ্জের দিন) সকাল থেকে যখন হাজীরা আরাফাতের জন্যে রওয়ানা হন, প্রত্যেক নামাযের পর তাদেরকে :

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدِ ـ

"আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল আহমদ" পাঠ করতে হবে। ১৩ যিলহজ্জ (অর্থাৎ যতক্ষণ হাজীরা মীনায় তাশরীফের দিন পালন করেন) পর্যন্ত এটি জারী রাখতে হবে। আবার ১০ই যিলহজ্জ তারিখে যখন হাজীরা মুযদালিফা থেকে মীনায় প্রত্যাবর্তন করে কুরবানী ও তওয়াফ সম্পন্ন করেন, তখন তাদেরকে দু'রাকআত নামায আদায় করে কুরবানী সম্পাদন করতে হবে।

মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত এ পদ্ধতি মুসলমানদের জন্যে একটা শান্ত্বনা লাভের উপায় হিসেবে কাজ করছিল। অর্থাৎ তারা মনে করতেন, হজ্জ থেকে বঞ্চিত করে দিলে কি হবে, তাদের মনতো হজ্জে মশ্‌গুল আছে এবং ঘরে বসেই তারা হাজীদের কাজে শরীক হতে পারছেন। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পরও একে জারী রেখে কার্যতঃ সমগ্র মুসলিম জাহানে হজ্জকে পরিব্যাপ্ত করে দেওয়া হয়েছে।

এর অর্থ এই দাড়ায় যে, শুধু মক্কায় হাজীদের মধ্যেই হজ্জ সীমাবদ্ধ নয়, বরং যে সময় সেখানে মাত্র কয়েক লক্ষ হাজী হজ্জের আনুষ্ঠানিক কর্মসূচী পালনে তৎপর হন, তখন মুসলিম জাহানের কোটি কোটি মুসলমানও তাদের কার্যাবলীর অংশীদার হয়। প্রত্যেক মুসলমান, তা সে যেখানেই থাক না কেন, তার দিল্‌ তাদেরই সহযাত্রী হয়। তার মুখ "আল্লাহু আকবার" তাক্‌বীর ধ্বনি উচ্চারণ করতে থাকে। হাজীদের কুরবানী ও তওয়াফের সময় সে তার স্বস্থানে নামায ও কুরবানী আদায় করতে থাকে।

পঞ্চমতঃ কুরবানীর যে পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ (সা) শিখিয়েছেন তা হলো এই যে, ঈদুল আযহার দু'রাকআত নামায আদায়ের পর কুরবানী করতে হবে এবং জানোয়ার যবেহ করার সময় বলতে হবে :

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ - اِنَّ صَلٰوتِیْ وَنُسُكِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ لاَ شَرِیْكَ لَهٗ وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ - اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ -

উচ্চারণ : ইন্নি ওয়াজ্‌জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাতারাস্‌ সামাওয়াতি ওয়াল আরদা হানীফাও ওয়া মা আনা মিনাল মুশ্‌রিকীন, ইন্না ছালাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহ্‌ইয়াইয়া ওয়া মামাতী লিল্লাহি রব্বিল আলামীন; লা-শারীকালাহু ওয়া বিযালিকা উমিরতু ওয়া আনা আউয়ালুল মুসলিমীন, আল্লাহুম্মা মিনকা ওয়া লাকা।

অর্থ : "আমি সর্বান্তকরণে আমার দৃষ্টি সেই সত্তার দিকে ফিরিয়ে নিয়েছি, যিনি আকাশসমূহ এবং পৃথিবী পয়দা করেছেন এবং আমি মুশরিকদের মধ্যে নই। নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার কুরবানী এবং আমার জীবন ও মৃত্যু সমস্ত কিছু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্যে। তার কোন শরীক নেই, আমাকে এরই হুকুম দেওয়া হয়েছে এবং আমি আনুগত্যের শির অবনতকারীদের মধ্যে প্রথম আছি। হে খোদা, তোমারই সম্পদ তোমার জন্যে হাযির করেছি।"

এই শব্দগুলো সম্পর্কে চিন্তা করুন। কুরআন মজীদে যে কারণগুলোর ভিত্তিতে কুরবানীর হুকুম দেওয়া হয়েছে এর মধ্যে সেগুলো সবই শামিল আছে। এর মধ্যে একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, দেবতাদের জন্যে যেসব মুশ্‌রিক কুরবানী করে, তাদের বিপক্ষে আমরা একমাত্র লা-শরীক আল্লাহর জন্যে কুরবানীর ইবাদত সম্পাদন করি। এর মধ্যে একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, খোদা তাঁর সৃষ্ট জন্তু-জানোয়ার থেকে উপকৃত হবার যে সুযোগ আমাদেরকে দান করেছেন, তার জন্য কৃতজ্ঞতা পেশ করার উদ্দেশ্যে তাঁর

সম্মুখে আমরা এ নজরানা পেশ করছি। এর মধ্যে একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, এ সম্পদের আসল মালিক আমরা নই, এ খোদার সৃষ্ট প্রাণী, তিনি একে ইচ্ছামত ব্যবহারের ক্ষমতা আমাদের দান করেছেন এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি হিসেবে আমরা এ নজরানা তাঁর সম্মুখে হাজির করেছি।

এর মধ্যে একথাও প্রকাশ করা হয়েছে যে, খোদার নির্দেশ মোতাবিক এইমাত্র আমরা তাঁরই উদ্দেশ্যে নামায আদায় করে আসলাম এবং এবার তাঁরই জন্যে কুরবানী ফরমান তামীল করতে উদ্যত হয়েছি। শুধু তাই নয়, এ শব্দগুলোর মাধ্যমে খোদার সাথে এ চুক্তি এবং একরারও করা হয়েছে যে, শুধু আমাদের নামায এবং কুরবানী নয়, আমাদের জীবন-মৃত্যুও সেই মহান সত্তারই জন্যে এ চুক্তি ও একরার নামা সেই ঐতিহাসিক দিনেই সম্পাদিত হয়, যেদিন খোদার দু'টি বান্দা খোদার জন্যে জীবন মৃত্যুর অর্থ তাঁদের কর্মের মাধ্যমে বাতলে ছিলেন।

উপরে যে পাঁচটি বিষয়ের আলোচনা করা হলো, সে সম্পর্কে একটু গভীরভাবে চিন্তা করুন। এগুলোর মধ্যে একজন নবীর খোদা প্রদত্ত অন্তর্দৃষ্টি এবং হিদায়াতলব্ধ জ্ঞান এতোই সুস্পষ্ট যে কুরবানী রাসূলের (সা) সুন্নাত হবার ব্যাপারে যদি অন্য কোন প্রমাণ নাই থাকতো, তাহলেও তার এ পদ্ধতির আভ্যন্তরীণ প্রমাণই এ ব্যাপারে যথেষ্ট হতো। কেননা যে খোদা কুরআন নাযিল করেছেন, তিনিই তাকে রাসূল (সা) নিযুক্ত করেছেন। কুরআন মজীদে কুরবানী সম্পর্কে যা কিছু এবং যতকিছু বলা হয়েছে, তা পড়ে কোন গায়ের নবী তা সে যতো বড় জ্ঞানী এবং আলেম হোক না কেন– এর চাইতে চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবে না যে, মুসলমানদেরকে মাঝে মাঝে খোদার জন্য কুরবানী করতে হবে।

একথাগুলো থেকে সে কখনো এ অর্থ হাসিল করতে পারবে না যে, সমগ্র মুসলিম জাহানের জন্যে কুরবানীর একটা বিশেষ দিন নির্ধারিত করতে হবে, সে দিনটিকে 'ঈদের দিন' ঘোষণা করতে হবে, সেদিনটি হবে হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাঈলের (আ) কুরবানীর দিন, সেদিনটি এবং তার আগে-পিছের দিনগুলো হজ্জের দিনের সাথেও সম্পর্ক যুক্ত হবে, সর্বোপরি এ কুরবানী এমন পদ্ধতিতে আদায় করতে হবে, যাতে ইসলামের

সমগ্র প্রাণশক্তি পুনরুজ্জীবিত হয়। এ অর্থ একমাত্র নবী ছাড়া কে গ্রহণ করতে পারতো ? যে নবীর ওপর খোদা তাঁর কুরআন নাযিল করেছিলেন, তিনি ছাড়া আর কেই বা রাখতো এ অর্থ গ্রহণের ক্ষমতা ?

কিন্তু এটি যে রাসূলের সুন্নাত, এ ব্যাপারে এর আভ্যন্তরীণ প্রমাণ ছাড়াও বাইরের প্রমাণ এতো বেশী আছে এবং সেগুলো এমন শক্তিশালী যে, হঠকারী মানুষ ছাড়া কেউ তা অস্বীকার করতে পারো না।

এর প্রমাণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, হাদীসের সমস্ত নির্ভরযোগ্য কিতাবে নির্ভুল ধারাবাহিক এবং সংযুক্ত সনদসহ অসংখ্য সাহাবায়ে কিরামের মুখ থেকে একথা উল্লেখিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ঈদুল আযহার কুরবানীর হুকুম দিয়েছেন, তিনি নিজেই এর ওপর আমল করেছেন এবং মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী পদ্ধতি হিসেবে এটি জারী করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় দশ বছর অবস্থান করেছিলেন এবং প্রত্যেক বছর তিনি কুরবানী করতেন। (তিরমিযী)

হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর পক্ষ থেকে আমাকে কুরবানী করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ জন্যে তাঁর তরফ থেকে আমি কুরবানী করে থাকি। (আবূ দাউদ, তিরমিযী)

হযরত বারায়া ইবনে আযিব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কুরবানীর দিন খুতবা দিয়েছিলেন এবং তাতে বলেছেন :

اول ما نبدأ به فى يومنا هذا ان نصلى ثم نرجع فننحر فمن فعل ذالك فقد اصاب سنتنا ـ

"আজকের দিনে আমরা প্রথমে নামায পড়ি তারপর ফিরে এসে কুরবানী দেই, অতঃপর যে এই পদ্ধতিতে কাজ করেছে, সে আমাদের পথে পৌঁছে গেছে।" (বুখারী, মুসলিম)

হযরত আয়েশা (রা) ও হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, الاضحى يوم يضحى الناس

"যেদিন সবাই কুরবানী করে সেদিন ঈদুল আযহা"। (তিরমিযী)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন :

من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا -

"যে ব্যক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করে না সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে।" (মুসনাদে আহমদ, ইবনে মাজা)

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

ما عمل ابن ادم يوم النحر عملا احب الى الله من هراقة دم -

"কুরবানীর দিন রক্তধারা প্রবাহিত করার চাইতে বনি আদমের অন্য কোন কাজ খোদার নিকট অধিক প্রিয় নয়।" (তিরমিযী, ইবনে মাজা)

হযরত বুরাইদা (রা) বলেন, ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহ থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা) কিছুই খেতেন না, পানও করতেন না এবং ফিরে এসে তিনি নিজের কুরবানীর গোশত খেতেন। (মুসনাদে আহমদ)

হযরত জাবির আবদুল্লাহ আনসারী (রা) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে ঈদুল আযহার নামায পড়েন, তারপর যখন রাসূলুল্লাহ (সা) ফিরে এলেন, তখন তাঁর সম্মুখে একটা ভেড়ী আনা হলো তিনি সেটিকে যবেহ করলেন। (মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, আবু দাঊদ)

ইমাম জয়নুল আবিদীন (র) হযরত আবু রাফি থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ঈদুল আযহার জন্যে দুটো হৃষ্ট পুষ্ট বড়ো বড়ো শিংধারী ভেড়ী খরিদ করতেন। ঈদের নামাযের পর খুতবা শেষ হয়ে গেলে একটা ভেড়ী তামাম উম্মতের তরফ হতে এবং অন্যটা নিজের এবং পরিবারবর্গের তরফ হতে কুরবানী করতেন। (মুসনাদে আহমদ)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ঈদগাহেই যবেহ এবং নাহার (উট যবেহ) করতেন। (বুখারী, নাসায়ী, ইবনে মাজা, আবু দাঊদ)

হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ঈদুল আযহার দিন দু'টো বড়ো বড়ো শিংধারী ভেড়ী কুরবানী দিয়েছিলেন। (বুখারী, মুসলিম)

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহও (রা) একই কথা বলেছেন। (আবু দাঊদ, ইবনে মাজা, বায়হাকী)

হযরত বারায়া ইবনে আযিব (রা) জুনদুব ইবনে সুফিয়ান আল বাজালী (রা) ও আনাস ইবনে মালিক (রা) সম্মিলিতভাবে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ঈদের নামাযের পূর্বে যবেহ করে, তার কুরবানী সিদ্ধ হয়নি এবং যে নামাযের পরে যবেহ করে, তার কুরবানী বিধিসম্মত হয়েছে এবং সে মুসলমানের তরীকার ওপর আমল করেছে। (বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমদ)

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কুরবানীর দিন মদীনায় আমাদের নামায পড়ান, নামাযের পর কয়েকজন লোক অগ্রবর্তী হয়ে তাঁর পূর্বেই কুরবানী করে। তিনি হুকুম দিলেন যে, যারা এ কাজ করেছে তাদেরকে আবার কুরবানী করতে হবে এবং নবী যতক্ষণ না তাঁর কুরবানী সম্পন্ন করেন, ততক্ষণ আর কেউ কুরবানী করতে পারবে না। (মুসলিম, মুসনাদে আহমদ)

এ বর্ণনাগুলো এবং এছাড়া আরো যে অসংখ্য বর্ণনা হাদীসে আছে, সবগুলোর বিষয়বস্তু একই। এমনকি এমন কোন দুর্বলতম বর্ণনা হাদীসে পাওয়া যাবে না যাথেকে একথা প্রমাণ হতে পারে যে, ঈদুল আযহার এ কুরবানী রাসূলুল্লাহর (সা) তরীকা নয়। এ প্রসংগে একথাও জেনে রাখা দরকার যে, হজ্জের সময় মক্কা মুয়াজ্জমায় ঈদুল আযহা অনুষ্ঠিত হয় না এবং কুরবানীর আগে কোন নামায পড়া হয় না। এজন্যে এ হাদীসগুলোয় মক্কার বাইরের সমগ্র দুনিয়ার ঈদ এবং কুরবানীর কথা বলা হয়েছে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসাবে নবুওয়াতের নিকটবর্তী যুগের মুসলিম ফকীহগণের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কুরবানী রাসূলুল্লাহর (সা) পদ্ধতি এবং শরীয়ত নির্দেশিত হবার ব্যাপারে তাঁরা সবাই একমত। এ ব্যাপারে একজন ফকীহও বিরুদ্ধ মত পোষণ করেননি। এ ফকীহগণের ব্যাপারে এ কথা চিন্তাই করা যায় না যে, তাঁরা সবাই বিনা অনুসন্ধানেই এটিকে রাসূলুল্লাহর (সা) সে তরীকা বলে মেনে নিয়েছেন। তারা যে যুগে বাস করতেন, সে যুগে মুসলমানদের এ কাজগুলো রাসূলুল্লাহর (সা) নিধারিত পদ্ধতি, না অন্য কেউ এ বিদায়াত জারী করেছে– একথা যাচাই

এবং অনুসন্ধান করার সমস্ত উপায়-উপকরণ মওজুদ ছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইমাম আবু হানীফার (র) কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ৮০ হিজরীতে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম এবং রাসূলুল্লাহর (সা) ইন্তেকালের মধ্যে মাত্র ৭০ বছরের ব্যবধান। তাঁর যমানায় অনেক দীর্ঘায়ু ও বয়োবৃদ্ধ সাহাবা বেঁচে ছিলেন। তা'ছাড়া খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ দেখেছিলেন ও সাহাবায়ে কিরামদের মজলিসে উঠা-বসা করতেন এমন লোকও বিভিন্ন স্থানে হাজার হাজার পাওয়া যেত। তদুপরি ইমাম সাহেব কুফা নগরে বাস করতেন এবং বেশ কয়েক বছর এ নগরটি হযরত আলীর (রা) রাজধানী ছিল। ইমাম সাহেবের জন্ম এবং হযরত আলীর (রা) শাহাদাত প্রাপ্তির মাত্র ৪০ বছরের ব্যবধান। চতুর্থ খলীফার যামানার অসংখ্য লোক সেখানে ছিলেন। কাজেই কেউ কি একথা চিন্তাও করতে পারেন যে, কুরবানীর এ পদ্ধতি কবে থেকে, কেমন করে এবং কে জারী করলো– এ সম্পর্কে অনুসন্ধান করার ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফার (র) কি কোন বিরাট বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হবার প্রয়োজন ছিল ?

এভাবে ইমাম মালিকের নামও উল্লেখ করা যেতে পারে। ৯৩ হিজরীতে মদীনা তাইয়েবায় তাঁর জন্ম হয়। সমস্ত জীবন তিনি এখানেই বসবাস করেন। এ শহরে তখন এমন অনেক খান্দান ছিল যাদের বয়োবৃদ্ধগণ খোলাফায়ে রাশেদার যামানা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সাহাবায়ে কিরামগণই তাদেরকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছিলেন। তাঁদের মুরব্বীগণ ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) শিক্ষাপ্রাপ্ত। সুতরাং এ কথা কি কেউ ধারণাও করতে পারেন যে, এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই তাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) যুগের কার্যাবলী বিস্মৃত হয়ে গিয়াছিলেন এবং ঈদুল আযহার কুরবানীর প্রচলন কে করলেন, তাদেরকে এ কথা জানাবার সেখানে একজনও ছিল না ?

প্রথম ও দ্বিতীয় হিজরীর ফকীহগণের ব্যাপারেও একই কথা বলা যেতে পারে। তাঁদের সবারই অবস্থান রাসূলুল্লাহর (সা) যানামার এতো নিকটবর্তী ছিল যে, সুন্নাত-বিদয়াতে অনুসন্ধান করা তাঁদের জন্যে মোটেই কষ্টসাধ্য ছিল না। কোন সুন্নাত বিরোধী জিনিসকে সুন্নাত হিসাবে গ্রহণ করার মতো মানসিকতায় বিভ্রান্ত হবার সুযোগ তাদের মোটেই ছিল না।

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হলো সমগ্র উম্মতের ধারাবাহিক কার্যাবলী। যেদিন থেকে রাসূলুল্লাহ (সা) ঈদুল আযহা এবং কুরবানী শুরু করেছেন, কার্যতঃ সেদিন থেকেই মুসলমানদের মধ্যে তার প্রচলন হয়েছে এবং তারপর থেকে আজ পর্যন্ত সমগ্র দুনিয়ার মুসলমান প্রতি বছর একে কার্যকরী করে আসছে। আজ পর্যন্ত একটি বছরও এর ফাঁক যায়নি। প্রত্যেক খান্দান পূর্ববর্তী খান্দানের কাছ থেকে ইসলামের পদ্ধতি হিসাবে একে গ্রহণ করেছে, তারপর সেটি পরবর্তী খান্দানকে সোপর্দ করা হয়েছে।

আসলে এটি একটি বিশ্বজনীন কাজ এবং দুনিয়ার যেখানেই কোন মুসলমান আছে সেখানেই একইভাবে এ পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। রাসূলুল্লাহর (সা) যুগ থেকে নিয়ে আমাদের যুগ পর্যন্ত প্রতি বছর এ কাজটি ক্রমাগত সম্পন্ন হয়ে আসছে, এর মাঝে ঈদুল আযহা ও কুরবানী ছাড়া একটি বছরও অতিক্রান্ত হয়নি। আসলে কুরআন যে ধারাবাহিকতা ও লোক পরম্পরায় আমাদের নিকট পৌঁছেছে এটিও ঠিক তাই। একই উপায়ে আমরা একথা জানতে পারি যে, আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ (সা) আরব দেশে খোদার নবীরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কোন দুষ্কৃতিমনা ফিতনাবাজ ব্যক্তি বর্তমানে এই ধারাবাহিকতাকে যদি সন্দেহযুক্ত বলতে চায় তাহলে ইসলামের আর কোন্ বস্তুটিই বা সন্দেহমুক্ত থাকে ?

এ ব্যাপারে আসলে কোনক্রমেই এ কথা বলা যায় না যে, আমাদের ইতিহাসের এক যুগে কুরবানী এবং ঈদের প্রচলন ছিল না, তারপর কোন প্রাচীন পুঁথিতে এর লিখিত নির্দেশ আবিষ্কৃত হয় এবং কতিপয় মোল্লা মৌলবী একত্রিত হয়ে জনগণকে বলে : "দেখো উমুক জায়গায় এ নির্দেশ আমরা লিখিতভাবে পেয়েছি। সুতরাং মুসলমান ভাইসব, এসো আমরা সবাই মিলে ঈদুল আযহা পালন করি এবং জানোয়ার কুরবানী করি।"

যদি এমন কোন ব্যাপার হতো, তাহলে অবশ্যই কোন না কোন প্রকারে ইতিহাসের পাতায় এর সন্ধান পাওয়া যেতো যে, এ ঘটনা কবে এবং কোথায় হয়েছিলো ? কারা এ জন্যে দায়ী ? তাছাড়া আর একটা কথাও আছে যে, মুসলমানদের মধ্যে কোন মৌলবী সাহেব কখনো এ মর্যাদা লাভ করেননি যে, কোন প্রাচীন পুঁথি থেকে কোন নির্দেশ বের করে দেখাবার পর

সমগ্র দুনিয়ার মুসলমান নিঃশব্দে তার কথা মেনে নিয়ে সেই মতো কাজ করতে শুরু করেছে এবং এর পরে আর কেউ এ কথাটি লিখে রাখবারও প্রয়োজন বোধ করেনি যে, পূর্বে তাদের মধ্যে এ পদ্ধতিটি প্রচলিত ছিল না, উমুক মৌলবী সাহেবের কথায় হালে এটিকে কার্যকরী করা হয়েছে।

এ তিন ধরনের প্রমাণ পরস্পরের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যশীল। হাদীসের অসংখ্য প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনা উম্মতের নির্ভরশীল ফকীহগণের গবেষণা ও অনুসন্ধান এবং সমগ্র উম্মতের যুগ পরম্পরায় ধারাবাহিক কার্যাবলী– সমস্ত থেকে একটি কথাই প্রমাণ হয়। অতঃপর এ পদ্ধতিটি যে রাসূলুল্লাহর (সা) নির্ধারিত এতে কি সন্দেহ থাকতে পারে ? এর বিপক্ষে কারুর কাছে যদি কোন তুচ্ছতম প্রমাণ থাকে যে, এ পদ্ধতিটি রাসূলুল্লাহর (সা) নির্ধারিত নয়, তাহলে অবশ্যই তাকে তা জনসমক্ষে পেশ করতে হবে এবং একথা আমাদেরকে বোঝাতেই হবে যে, কবে কোন্ মৌলবী সাহেব, কোথায় এটি উদ্ভাবন করেছিলেন ? এবং কেমন করে গোটা মুসলিম জাহান বিপুলভাবে প্রতারিত হয়ে একে রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাত বলে মেনে নিয়েছিলো ?

আসলে আমাদের চিন্তার অবনতি এবং চারিত্রিক অধঃগতির এর চাইতে লজ্জাষ্কর পরিণতি আর কি হতে পারে যে, আমাদের যে কোন ব্যক্তিই দ্বীনের প্রামাণ্য বহুজন স্বীকৃত ও সর্ববাদীসম্মত সত্য বরং তার বুনিয়াদগুলোর বিরুদ্ধে বেপরোয়াভাবে এবং নির্বিকার চিত্তে চ্যালেঞ্জ করার দুঃসাহস করে, তারপর দেখতে দেখতে তার সমর্থনেও কিছুলোক অগ্রসর হয়। অথচ তার কাছে শুধু একটি ভুয়া দাবী ছাড়া অন্য কোন দলীল প্রমাণের অস্তিত্বই নাই।

অনেক কাঠখড় পোড়াবার পর জনসাধারণকে প্রতারিত করার জন্যে প্রতি বছর খুব বেশী মূল্যবান মনে করে একটি যুক্তি (?) বার বার পেশ করা হয়। বলা হয়, প্রতি বছর কুরবানীতে লক্ষ লক্ষ টাকা নষ্ট করা হয়। পশু কুরবানী না করে সেই টাকাগুলো জনকল্যাণ অথবা জাতীয় উন্নয়নমূলক কোন কাজে ব্যয় করা উচিত। কিন্তু কথাটি নিতান্তই ভ্রান্ত। এর কয়েকটা কারণ আছে।

প্রথমতঃ কুরআন এবং সুন্নাহ থেকে যে বস্তুটি খোদা ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ বলে প্রমাণিত, সে সম্পর্কে কোন মুসলমান– যদি সে সত্যিকার মুসলমান হয়– একথা চিন্তাই করতে পারে না যে, তার জন্যে অর্থ সম্পদ অথবা সময়-মেহনত ব্যয় করলে তা নষ্ট হয়ে যায়। একথা যে চিন্তা করে, সে এসবের চাইতে অনেক বেশী মূল্যবান তার ঈমানকেই নষ্ট করে।

দ্বিতীয়তঃ ইসলামের দৃষ্টিতে জনকল্যাণ এবং জাতীয় উন্নয়নমূলক কাজেরও একটি মূল্য আছে। কিন্তু তার দৃষ্টিতে এর চাইতেও অনেক বেশী মূল্যবান কথা হলো এই যে, মূল্যবান যে কোন প্রকারেই হোক, শিরক থেকে দূরে থাকবে, তৌহিদ-বিশ্বাস তার চিন্তা ও কর্মের সাথে পুরোপুরি সংযোজিত হবে এবং তাদেরকে শক্তিশালী করবে। খোদার শোকর গুজারী, তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি এবং ইবাদত বন্দেগী করার অভ্যাস তার সমগ্র জীবনের শিকড় গেড়ে বসবে এবং খোদার সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে সে নিজের সব কিছুই কুরবান করার জন্যে প্রস্তুত থাকবে। এ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে খোদা এবং তাঁর রাসূল (সা) যে কাজগুলোকে প্রয়োজনীয় মনে করেছেন, কুরবানীও তার অন্তর্ভুক্ত। কুরবানীর জন্যে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা, জনকল্যাণ ও জাতীয় উন্নয়নের কাজে ব্যয় করার চাইতে অনেক বেশী মূল্যবান। একে অপচয় সেই ব্যক্তি মনে করে, যার মূল্যবোধ আসলে ইসলামী মূল্যবোধ থেকে পৃথক হয়ে গেছে।

তৃতীয়তঃ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা) যে ইবাদতের জন্যে যে পদ্ধতি নির্ধারিত করেছেন, অন্য কোন বস্তু তার প্রতিবদল হতে পারে না। অবশ্য আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা) নিজেরাই যদি দুটো অথবা তিনটে বিকল্প পদ্ধতি আমাদের সামনে পেশ করতেন, তারপর আমাদেরকে তার মধ্য থেকে যে কোন একটা গ্রহণ করার এখতিয়ার দিতেন, তাহলে তো কোন কথাই ছিল না। তা যখন নয়, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, সেভাবেই প্রত্যেকটি হুকুম তামীল করাই আমাদের ওপর ফরয। আমরা স্বেচ্ছাকৃতভাবে তার জন্যে কোন বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি না। নামাযের পরিবর্তে কোন ব্যক্তি যদি তার সমস্ত ধন-দৌলত দান করে দেয়, তাহলেও তা এক ওয়াক্তের নামাযের প্রতিবদল হতে পারে না।

অনুরূপভাবে কুরবানীর পরিবর্তে যতো বড়ো নেকী আপনি করুন না কেন, তা কখনো ঈদুল আযহার তিন দিন সজ্ঞানে কুরবানী না করার প্রতিবদল হতে পারে না বরং এ কাজটি সম্পন্ন করার পেছনে যদি এমন কোন মনোভাব থাকে যে, এ ইবাদতের জন্যে আমরা খোদা ও তাঁর রাসূলের (সা) চাইতে ভালো এবং উন্নততর (?) একটা পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছি, তাহলে নেকীতো দূরের কথা ভীষণ গোনাহ্গার হতে হবে।

তারপর দ্বীনি দৃষ্টিভংগী হতে দূরে সরে গিয়ে নিছক সামাজিক দৃষ্টিভংগিতে এই "অপচয়ের" অদ্ভুত ধারণাটি বিশ্লেষণ করুন। দুনিয়ায় এমন কোন জাতিই নেই, যারা তাদের পালা-পার্বন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উৎসবে লক্ষ লক্ষ, কোটি-কোটি টাকা খরচ করে না। নিছক অর্থের মাপকাঠিতে বিচার করার এবং টাকার তুলাদণ্ডে ওজন করার চাইতে এগুলোর তমদ্দুনিক, সামাজিক এবং নৈতিক উপকার অনেক বেশী।

ইউরোপ এবং আমেরিকার কোন কঠোর জড়বাদীকেও আপনি এ কথা স্বীকার করাতে পারবেন না যে, প্রতি বছর বড় দিনের উৎসবে সমগ্র খৃষ্টান জগত যে অজস্র অর্থ ব্যয় করে, সেগুলো "অর্থের অপচয়।" বরং আপনার এ কথাটিকে সে পুনর্বার আপনারই মুখে ছুড়ে মারবে। সে কোন চিন্তা না করেই জবাব দেবে, সমগ্র দুনিয়ার খৃষ্টানরা হাজার হাজার সম্প্রদায়ে এবং রাজনৈতিক দলে বিভক্ত, এই শতধা বিচ্ছিন্ন জাতি ভাগচক্রেই আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যদি একটা উৎসব পালনের সুযোগ লাভ করে থাকে, তাহলে এর সামগ্রিক ও নৈতিক উপকার এর অর্থ ব্যয়ের চেয়ে অনেক বেশী।

হিন্দুদের মতো অর্থলোভী জাতিও তাদের পূজা পার্বন এবং উৎসব অনুষ্ঠানাদিতে যে অর্থ ব্যয় করে তাকে অর্থের তুলাদণ্ডে ওজন করতে তারা কখনো রাযী হয় না। কেননা এভাবে তাদের মধ্যে একটা ঐক্যসূত্র গড়ে তোলার জন্যে বিরাট পরিবেশ সৃষ্টি হয়; নচেৎ তাদের মধ্যে বিভেদ-বৈষম্য এবং জাতিভেদ এতো বেশী যে কখনো একস্থানে একত্রিত হয়ে তারা এক জাতিতে পরিণত হতে পারতো না। দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি মাঝে মাঝে সংঘবদ্ধভাবে যেসব সামাজিক উৎসব পালন করে থাকে, সেগুলোও ঠিক এই ধরনের। প্রত্যেকটি উৎসব একটা অনুভূত আকৃতির প্রত্যাশী এবং এই

আকৃতিকে বাস্তবায়িত করার জন্যে অনেক কিছু ব্যয়িত হয়। কিন্তু কোন জাতিও কখনো এ আহাম্মুকীর কথা চিন্তা করে না যে, শুধু স্কুল-কলেজে, হাসপাতাল আর কারখানার কাজেই সবকিছু খরচ করা উচিত আর এসব উৎসব-অনুষ্ঠান একেবারেই নিরর্থক।

অথচ আমাদের ঈদুল আযহার যে উন্নত এবং আধ্যাত্মিক, মানসিক ও নৈতিক প্রাণশক্তি বিদ্যমান, দুনিয়ার অন্য কোন জাতির উৎসব-অনুষ্ঠানাদিতে তা নেই। আমাদের ঈদ উৎসবের মতো অন্য কোন জাতির উৎসব পালন পদ্ধতি এতো বেশী শিরক ও নৈতিকতা বিরোধী কার্যাবলী এবং নোংরামী বিবর্জিত নয়। আমাদের ঈদের ন্যায় দুনিয়ার অন্য কোন উৎসবের জন্যে খোদার কিতাবের এবং তাঁর রাসূলের (সা) নির্দেশ নেই। তবুও কি আমরা জড়বাদীতায় এখন সবাইকে পেছনে ফেলে যাবার এরাদা করে নিয়েছি ?

তাছাড়া কুরবানীতে "অর্থের অপচয়ের" তাৎপর্যই বা কি ? একে অর্থের অপচয় কেমন করে বলা যেতে পারে ? আমাদের জাতির যেসব লোকেরা পশু পালন এবং তার ব্যবসায় করে, কুরবানীর জন্যে ক্রীত জানোয়ারের মূল্য তাদেরই পকেটে প্রবেশ করে। একে যদি "অর্থের অপচয়" বলা হয়, তাহলে দেশের সমস্ত বাজার ও দোকান-পাট বন্ধ করে দিতে হবে। কেননা সেখানে জিনিসপত্র ক্রয় করাব দরুন প্রতিদিন কোটি কোটি টাকার অপচয় হয়। তদুপরি জানোয়ার খরিদ করে তাকে কি মাটির নীচে পুঁতে ফেলে দেয়া হয়, না আগুনে নিক্ষেপ করা হয় ? তাদের গোশত এই মানুষেরাই খায়। তবুও যদি একে অপচয় বলা হয়, তাহলে সারা বছর মানুষের খাদ্যের জন্যে যা কিছু ব্যয় করা হয়, যে কোন প্রকারেই তার পথ রোধ করা উচিত।

সম্প্রতি আর একটা কথা শোনা যাচ্ছে। অর্থাৎ আমাদের দেশে দিনে দিনে পশুর সংখ্যা নাকি কমে আসছে। এ কারণে দুধ ও ঘির উৎপাদনও নাকি কমে গেছে। এর প্রতিকারের জন্যে সরকার একদিনে পরিবর্তে দু'দিন গোশত বন্ধ করে দিয়েছিলেন কিন্তু এতেও কাজ হয়নি। সম্ভবত এখন থেকে একে বাড়িয়ে দু'দিনের পরিবর্তে তিনদিন করতে হবে। এ পরিস্থিতিতে ঈদুল আযহার কুরবানীর ওপর পাবন্দি লাগানো উচিত। কেননা এভাবে এ

উৎসবে যদি হাজার হাজার জানোয়ার কুরবানী করা হয়, তাহলে শীগ্গীরই জানোয়ারের সাথে সাথে দুধ ঘি'রও চরম অভাব দেখা দেবে।

পশুর সংখ্যাল্পতা সম্পর্কে অবশ্য একটা কথা বলা যেতে পারে। কিন্তু পশুর উৎপাদন ধীরে ধীরে কমিয়ে দেয়ার চাইতে দেশকে পশু শূন্য করার কার্যকরী নোস্খা আর কিছুই হতে পারে না। কেননা যারা পশু পালন করে পশু কাট্তি না হবার সাথে সাথে তাদের পশু পালন ব্যবসাও স্তিমিত হয়ে আসবে। যখন দেশে পশুর চাহিদা এতো কমে যাবে যে, সারা বছরের ১৫৬ দিনতো এমনিই বিক্রয় বন্ধ থাকবে, তারপর বছরের মধ্যে মাত্র যে তিনটি দিনের আশায় পশু ব্যবসায়ীরা হাজার হাজার পশু প্রতিপালন করে, তখনও বাজারে মন্দাভাব দেখা দেবে, বলাবাহুল্য তখন এ কাজে তাদের আর কোন আকর্ষণ বাকি থাকতে পারে না। তারা অন্য কোন কাজ করে রুজি-রোজগার তালাশ করতে বাধ্য হবে। ধীরে ধীরে পশু পালন কমিয়ে দেবে। তারপর যখন জানোয়ার যোগান দেয়া কমে আসবে এবং দেশের প্রয়োজনাতিরিক্ত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ এর প্রতিকারে উদ্যোগী হয়ে সপ্তাহে আরো কয়েক দিন গোশ্ত বন্ধ, কুরবানীর ওপর পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা জারী করে দেবেন, তখন একদা এ দেশটি আপনা-আপনিই অহিংসার পীঠস্থান এবং জৈনধর্মের জান্নাতে পরিণত হবে। জানি না এইসব অভিজ্ঞানীদেরকে কোন মহাজ্ঞানী ব্যক্তি পরামর্শ দিয়াছেন যে, জানোয়ারের সংখ্যাল্পতার প্রতিষেধক হিসেবে বংশ বৃদ্ধির সুযোগ-সুবিধা দান এবং পশুপালনকে উৎসাহিত করার পরিবর্তে বাজারে জানায়োরের চাহিদা হ্রাস করতে হবে।

দুধ এবং ঘির অভাব প্রসংগে বলা যেতে পারে যে, জানোয়ার যবেহ্ করার সাথে এর সূত্র জুড়ে দেয়া শুধুমাত্র তাদেরই কাজ হতে পারে, যারা বিদেশাগত শাসকের মতো এদেশে বসবাস করেন। একেবারে বিদেশীর মতো তাঁরা স্বগৃহের একান্তে বসে এই ধারণা করে নিয়েছেন যে, নিশ্চয়ই দুগ্ধবতী জানোয়ারগুলোকেই হাজারে হাজারে যবেহ্ করা হচ্ছে, তবেইতো দেশে দুধ ও ঘি'র উৎপাদন কমে যাচ্ছে। অথচ এ দেশে দুগ্ধবতী গবাদি পশুর মূল্য কতো, গোশ্তের দর কি এবং এখানকার একটা জানোয়ার

থেকে সাধারণতঃ কতটা পরিমাণ গোশ্‌ত পাওয়া যায়– দেশের বিভিন্ন এলাকা পরিভ্রমণ করলে তাঁরা অবশ্যই তা জানতে পারতেন। ফলে একথা তাদের সহজেই বোধগম্য হতো যে, একমাত্র সেই কসাই-ই দুগ্ধবতী জানোয়ার যবেহ করে তার গোশ্‌ত বিক্রি করতে পারে, যে কিছু অর্থোপার্জনের পরিবর্তে নিজের পকেট থেকে খরচ করে ক্রেতাদেরকে খাওয়াবার নিষ্কলুষ ইচ্ছা পোষণ করে এবং শুধু সেই ব্যক্তিই বকরি ঈদের সময় দুগ্ধবতী গবাদি পশু খরিদ করে কুরবানী করতে পারে, যার মাসিক আয় হাজার টাকার ঊর্ধ্বে।

হালে জনৈক গবেষক কুরবানীকে পুরোপুরি বন্ধ না করে তাকে সীমিত করবার এবং সরকারকে এই সীমিত করণের ক্ষমতা দান করে সীমাতিরিক্ত কুরবানীগুলোর অর্থ জনসেবার কাজে ব্যয় করার উদ্দেশ্যে শরীয়তের কতিপয় নির্দেশ আবিষ্কার করেছেন। এবার তাঁর কথাটি শুনুন :

তিনি বলেন, একমাত্র ইমাম আবু হানীফা (র) কুরবানীকে ওয়াজিব মনে করেন। নচেৎ অন্যান্য ইমামগণ সবাই একে সুন্নাত বলেন। অথচ শুধু ইমাম আযম একে ওয়াজিব মনে করেন এবং বাকী ইমামগণ এ অর্থে সুন্নাত মনে করেন যে, একে কার্যকরী করা অথবা না করার কোন গুরুত্বই নেই, এ দুটো কথাই মূলতঃ ভুল। ইমাম মালিক (র) এবং ইমাম আওযায়ীও (র) কুরবানীকে ওয়াজিব বলেন। আর ইমাম শাফেয়ী (র) এবং আর যারা একে সুন্নাত মনে করেন, তাঁরা সবাই বলেন একে সুন্নাতে মুয়াক্কিদা। অর্থাৎ কুরবানী পালনে বিরত থাকা জায়েয নয়।

তিনি বলেন, কুরবানীকে সীমিত করাই রাসূলুল্লাহর (সা) উদ্দেশ্য ছিল। কেননা কুরবানীর হুকুম তিনি মাত্র সামর্থবান লোকদেরকে দিয়েছিলেন এবং হাদীসে এও বলা হয়েছে :

على كل اهل بيت فى كل علم اضحية وعتيرة ـ

“প্রত্যেক গৃহের বাসিন্দাদেরকে প্রতি বছর ঈদুল আযহা এবং রজব মাসে একটি করে কুরবানী করতে হবে।” অথচ তিরমিযীর কথায় এটি দুর্বল হাদীস এবং এর বর্ণনাকারী সন্দেহযুক্ত এবং আবু দাঊদ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, রজব মাসের কুরবানীর হুকুম রাসূলুল্লাহ (সা) পরে বাতিল

করে দিয়েছিলেন। তবুও এখানে এ নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি না করলেও প্রশ্ন থেকে যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) পরে বাতিল করে দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) যদি কোন বস্তুকে অত্যাবশ্যকীয় করে তার কোন সর্বনিম্ন সীমা নির্ধারণ করেন, তাহলে কি সত্যিই তাথেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় যে, তিনি তাকে সীমিত করতে চান ? নামায শুধুমাত্র পাঁচ ওয়াক্তের কয়েক রাকআতই ফরয। এর অর্থ কি এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযকে সীমিত করতে চান এবং ফরয রাকআতের অধিক নামায পড়া তিনি পসন্দ করেন না ? রমযান মাসের রোযাই ফরয। এর অর্থ কি এই যে, রোযাকে সীমিত করা হয়েছে এবং অতিরিক্ত রোযা অপসন্দনীয় ? যাকাতের একটা সীমাবদ্ধ পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে এবং শুধুমাত্র বিশেষ পরিমাণ অর্থের মালিককে যাকাত আদায় করতে হয়। খোদার পথে খরচ করাকে সীমিত করাই কি এর উদ্দেশ্য ? বিশেষ পরিমাণ অর্থ যার নেই, তিনি যদি খোদার পথে অর্থ ব্যয় করেন অথবা যাকাত আদায়কারী যাকাত ছাড়া যদি কারো কিছু দান খয়রাত করেন, তাহলে কি তা অপসন্দনীয় হবে ?

তিনি কুরআন থেকে কতিপয় নজীর পেশ করেছেন। তিনি বলেন, হজ্জের কতিপয় সুবিধা ভোগকারী এবং কোন নীতি বিরোধী কাজে লিপ্ত ব্যক্তিকে কুরবানীর আদেশ করা হয়েছে, তার জন্যে রোযা অথবা অর্থ দানের বিকল্প ব্যবস্থা আল্লাহ নিজেই পেশ করেছেন। এথেকে তিনি প্রমাণ করছেন যে, অনুরূপভাবে ঈদুল আযহার কুরবানী বিকল্প ব্যবস্থাও পেশ করা যেতে পারে। অথচ তাঁর প্রমাণের নীতিগত গলদ আছে। সেখানে একটি ওয়াজিব আদায়ের জন্যে আল্লাহ নিজেই তিনটি বিকল্প ব্যবস্থা পেশ করেছেন। আর এখানে আপনি খোদার নির্ধারিত একটি মাত্র ইবাদত পদ্ধতির বিকল্প পেশ করছেন। জিজ্ঞেস করি, এ এখতিয়ার আপনাকে কে দিয়েছে ? এভাবে কি আপনি নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত এবং ইবাদতের বিকল্প নিজেই গ্রহণ করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন ?

অতঃপর তিনি "হেদায়ার" একটি বাক্যের সম্পূর্ণ ভুল অর্থ গ্রহণ করে বলেছেন, কুরবানীর সময় যদিও কুরবানী করাই বেহতের কিন্তু তার পরিবর্তে জানোয়ারের মূল্য দান করাও বৈধ। অথচ কোন ফকীহই একথা

সমর্থন করেননি যে, ঈদুল আযহার সময় কুরবানীর জানোয়ারের মূল্য দান করা কুরবানীর বিকল্প হতে পারে। 'হেদায়া' লেখক যদি একথা জানতে পারতেন যে, এমন এক যুগ আসবে যখন তাঁর–

التضيحة فيها افضل من التصدق بثمن الاضحية ـ

"আত্‌তযীহাতু ফীহা আফযালু মিনাত্‌ তাসাদ্দুকি বিছামানিল উয্‌হিয়া।"

– কথার অর্থ এই ধরা হবে যে, 'কুরবানীর সময় কুরবানীর পরিবর্তে জানোয়ারের মূল্য দান করাও বৈধ' তাহলে নিশ্চয়ই তিনি এ জন্যে দশবার তওবা করতেন। 'হেদায়া'ইতো হানাফী ফিকাহর একমাত্র কিতাব নয়। আরো অসংখ্য কিতাব এখনো বিদ্যমান। তাদের প্রায় সবগুলোতেই একথা স্পষ্ট লিখিত আছে যে, এ সময় অন্য কোন প্রকার দান কুরবানীর বিকল্প হতে পারে না।

তিনি আর একটা মজার যুক্তি পেশ করেছেন। তিনি বলেন, আজকের মানুষের আন্তরিকতা ও খোদাভীতি কম হয়ে গেছে এবং এর পরিবর্তে মানুষ শুধু অহংকার ও প্রদর্শনেচ্ছা এবং নাম কেনার লোভেই কুরবানী করছে। অন্য কথায় বলা যায়, এই সব লোক যখন কুরবানীর পরিবর্তে জাতীয় তহবিলে– তাও আবার সরকারী তহবিলে– মোটা মোটা চাঁদা দেবে তখন এ কাজটা হবে চরম আন্তরিকতা এবং খোদাভীতির প্রকাশ। অতঃপর একথা মোটেই বিস্ময়কর হবে না যে, প্রত্যেক মসজিদে "আন্তরিকতা পরিমাপ-যন্ত্র" নিয়ে একজন সরকারী লোক দাঁড়িয়ে থাকবেন। তিনি পরিমাপের মাধ্যমে প্রত্যেক "প্রদর্শনেচ্ছু" নামাযীকে নফল এবং সুন্নাত নামায ত্যাগ করে তার পরিবর্তে জাতীয় তহবিলে জমা দেবার নির্দেশ দেবেন।

এইসব দুর্বল ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো হয়েছে গবেষণার সাত মহল। এর পরেও কি প্রমাণ হয় যে কোন কুরবানীকে সীমিত করাই শরীয়তের উদ্দেশ্যের অনুকূল ?

সমাপ্ত

ঈদুল আযহার দু'রাকআত নামায আদায়ের পর কুরবানী করতে হবে এবং জানোয়ার যবেহ করার সময় বলতে হবে :

اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ - اِنَّ صَلٰوتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ - اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ.

উচ্চারণ : ইন্নি ওয়াজ্‌জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাতারাস্‌ সামাওয়াতি ওয়াল আরদা হানীফাও ওয়া মা আনা মিনাল মুশ্‌রিকীন, ইন্না ছালাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহ্‌ইয়াইয়া ওয়া মামাতী লিল্লাহি রব্বিল আলামীন; লা-শারীকালাহু ওয়া বিযালিকা উমিরতু ওয়া আনা আউয়ালুল মুসলিমীন, আল্লাহুম্মা মিনকা ওয়া লাকা।

অর্থ : "আমি সর্বান্তকরণে আমার দৃষ্টি সেই সত্তার দিকে ফিরিয়ে নিয়েছি, যিনি আকাশসমূহ এবং পৃথিবী পয়দা করেছেন এবং আমি মুশরিকদের মধ্যে নই। নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার কুরবানী এবং আমার জীবন ও মৃত্যু সমস্ত কিছু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্যে। তার কোন শরীক নেই, আমাকে এরই হুকুম দেওয়া হয়েছে এবং আমি আনুগত্যের শির অবনতকারীদের মধ্যে প্রথম আছি। হে খোদা, তোমারই সম্পদ তোমার জন্যে হাযির করেছি।"